অপরিচিতা গল্প ও বস্তুর উদ্ধৃতির ভিত্তিতে নারীর এগিয়ে চলার পথে সহায়ক ভূমিকা নিরূপণ :-

"অপরিচিতা" গল্পে কল্যাণীর সংকট বলতে মূলত বাবার কথায় লগ্নভ্রষ্ট হওয়াকে বুঝিয়েছে। যা সমাজে নির্ভরশীল মেয়েদের জন্য সুখকর না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "অপরিচিতা" গল্পে আমরা যৌতুকপ্রথার চিত্র দেখতে পাই যা অনুপমের মামার চরিত্রের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। অনুপমের মামাই অনুপমের জীবনের সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। মামার লোভ ও স্বার্থপরতার কারণে গহনা পরীক্ষা নিয়ে বিয়ের আসরে অপমানজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি কন্যার পিতাকে অসম্মান করেছিলেন। কল্যাণীর বাবা, শম্ভুনাথ লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে নিজের ও কল্যাণীর আত্মসম্মানের কথা বিবেচনা করেছেন। ফলে অনুপম ও কল্যাণীর বিয়ে হয় না। লগ্নভ্রষ্ট হওয়ায় কল্যাণী সংকটাপন্ন হয়।

আত্মমর্যাদার কারণে কল্যাণীর লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার পরেও তার হতাশ না হওয়া ও পরবর্তীতে বিয়ে না করে দেশমাতৃকার কল্যাণে আত্মনিয়োজিত করার মধ্যে কল্যাণীর চরিত্রে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

কল্যাণীর সাথে অনুপমের বিয়ের সকল আয়োজন হওয়ার পরেও অনুপমের মামার হীনমন্যতা ও কল্যাণীর বাবার ব্যক্তিত্ববোধের

কারন তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেখানে কল্যাণী তার বাবার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন দিয়ে অনুপমকে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু কল্যাণী তা করেনি। বরং কখনো বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দেশের কল্যাণে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছে। এখান থেকেই তার দৃঢ়চেতা মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

২. অনুপম ও অন্যান্যদের ভূমিকা ইতিবাচক হলে কল্যাণীর জীবন কেমন হতে পারত তার বিবরণ।

=> অনুপম ও অন্যান্যদের ভূমিকা ইতিবাচক হলে কল্যাণীর জীবন একটি বিবাহিত সুখী মেয়ের আশানুরূপ হতে পারতো।

"অপরিচিতা" গল্পে অনুপমকে ভূমিকাহীন দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো ভূমিকাই নেই। অনুপম যদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতো, প্রয়োজনে নিজের মতামত প্রদান করতো তাহলে বিয়ের আসরে তার মামার কারনে অপমানজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। সে যদি মামাকে বাধা দিতো তাহলে তার ও কল্যাণীর বিয়ে সুসম্পন্ন হতে পারতো, ফলে কল্যাণীর জীবন ও গল্পের শেষ পরিণতিও আলাদা হতে পারতো।

অনুপমের মামা যদি যৌতুকপ্রথা বিরোধী না হয়ে হতেন লোভী ও নিচ মানসিকতাসম্পন্ন না হতেন তাহলে কল্যাণীর

জীবনে অনেক বড় পরিবর্তন আসতো। প্রথমত, মামা যৌতুকবিরোধী হলে গল্পে যৌতুক নিয়ে কোনো কথাই আসতো না। আবার যৌতুক নিলেও বিয়ের আসরে যদি সোনা পরীক্ষা করতে স্যাকরার মাধ্যমে হীনমন্যতার পরিচয় না দিতেন তাহলে অনুপম ও কল্যাণীর বিয়ে সুসম্পন্ন হতে পারতো। গল্পে মামার নেতিবাচক ভূমিকা সবচেয়ে বেশি ছিল। তাই উনার মনের পরিচয় দিয়ে ইতিবাচক প্রভাব রাখলে কল্যাণীর সুন্দর সাজানো বিবাহিত জীবন হতে পারতো।

গল্পের খুবই সামান্য নেতিবাচক ভূমিকা আছে অনুপমের মায়ের। তিনি অনুপমের মামার পক্ষে ছিলেন বলা যায়, কারণ তিনি তার ভাইয়ের কাজে বাধা দেননি। যদিও তার নেতিবাচক ভূমিকার পরিসর খুব ক্ষুদ্র। তবুও তিনি তার ভাইয়ের আচরণ ও কাজকর্মের বিপক্ষে কথা বলার মাধ্যমে গল্পকে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারতেন।

সুতরাং, "অপরিচিতা" গল্পে অনুপম, তার মা ও মামার নেতিবাচক ভূমিকার পরিসর আলাদা হলেও তাদের ইতিবাচক ভূমিকার ফলাফল একই হতো। তা হলো কল্যাণী ও অনুপমের বিয়ে সুসম্পন্ন হওয়া ও একটি মেয়ে হিসেবে কল্যাণীর আশানুরূপ বিবাহিত জীবন পাওয়া। ফলে গল্পের কাহিনি আলাদা দিকে প্রভাবিত হতে পারতো।

৩. বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে চেনা / জানা কোনো নারীর এগিয়ে চলার পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করুন।

=> আমাদের আশেপাশে এমন অনেক নারী আছেন যারা সমাজের পুরুষের মতোই অবদান রাখতে চান, দেশ ও দশের উপকারে আসতে চান। কিন্তু তাদেরকে প্রতিনিয়ত নানারকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমার জানা এরকম একজন নারী হলেন জাহানারা বেগম। তিন সন্তানের মা ও পেশায় একজন নার্স। প্রতিবন্ধকতার শিকার হওয়া এরকম নারীদের প্রতিনিধি হিসেবে জাহানারা বেগমকে বিবেচনা করলে আমরা নির্দিষ্ট কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখতে পাই। সেগুলো হলো :-

নারীবিরোধী সমাজের নেতিবাচকতা :- আমাদের সমাজে এখনও এমন মানুষ পুরুষ আছে যারা মনে করে নারীর কাজ শুধুমাত্র সংসার সামলানো। জাহানারা বেগমের মতো বিবাহিত চাকরিজীবী নারীদের জন্য এই সমাজ অভিশাপস্বরূপ, কারণ নারীরা বাসার বাইরে কাজ করবে, অর্থ উপার্জন করবে - এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনা।

পুরুষশাসিত সমাজ : এরকম সমাজে শুধুমাত্র পুরুষের মতের মূল্য আছে। ফলে তারা যা বলে নারীদেরকে তাই পালন করতে হয়। জাহানারা বেগমকে তার চাকরির বিষয়ে তার স্বামী নানা বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করতো। তাকে প্রথমে সবই মেনে চলতে হতো। এরকম পুরুষশাসিত সমাজের কারণে নারীরা অনেকাংশে পরাধীন।

শারীরিক নির্যাতন: শারীরিক নির্যাতন নারীর এগিয়ে যাওয়ার পথে অন্যতম একটি প্রতিবন্ধকতা। জাহানারা বেগমের স্বামী ও পরিবারের লোকজন বিভিন্নভাবে শারীরিক নির্যাতন করেছেন, যদিও তিনি দমে যান নি। আমাদের সমাজে নারীরা কর্মক্ষেত্রে, ক্ষ যাওয়ার পথে বিভিন্নভাবে হেনস্তার শিকার হয়ে থাকেন। বিবাহিত অনেক মেয়েকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন মারধর করে থাকেন, এসব কারণে অনেক নারী দমে যান, আবার জাহানারা বেগমের মতো অনেক নারী এসব বাধা উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যান।

মানসিক নির্যাতন: শারীরিক নির্যাতনের মতো মানসিক নির্যাতনও ব্যাপক বাধা প্রদান করে। চলার পথে মেয়েদের প্রতি কটূক্তি, বিবাহিত মেয়ের ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ি লোকজনের কটাক্ষ করা, কর্মক্ষেত্রে বা চলার পথে ইভটিজিং এর শিকার হওয়া মানে একরকম মানসিকভাবে নির্যাতিত হওয়া। জাহানারা বেগমকে এরকম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

ধর্মীয় গোঁড়ামি: ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদেরকে চার দেওয়ালের মাঝে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়। মুসলিম নারী হিসেবে জাহানারা বেগমকেও পর্দা, শালীনতা, ইত্যাদির দোহাই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে পর্দানশীল, শালীন হয়েই বাইরে ও কাজ করা যায়। তবুও ধর্মীয় গোঁড়ামি অন্যতম একটি প্রতিবন্ধকতা।

আমার দেখা জোহানারা বেগমের মতো প্রতিনিয়ত হাজার হাজার নারী নানা রকম বিপত্তির শিকার হচ্ছে, কিন্তু তাদেরকে তো দমিয়ে রাখা যাবে না। তারা অধিকার সচেতন হয়ে প্রতিবাদ করবেই ও সামনে এগিয়ে যাবে।

৪. পঠিত গল্প ও দেখা / জানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নারীর এগিয়ে চলার পথে সহায়ক ভূমিকাগুলো চিহ্নিত কর।

=> নারীর এগিয়ে চলার পথে নানারকম প্রতিবন্ধকতা যেমন আছে তেমনি নানারকম সহায়ক ভূমিকাও আছে। "অপরিচিতা" গল্প ও আমার জানা জোহানারা বেগমের সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়ক ভূমিকাগুলো হলো :

পারিবারিক সহায়তা : "অপরিচিতা" গল্পে কল্যাণী লগ্নভ্রষ্ট হলেও সে হতাশ হয়নি বরং দৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছে। এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা ছিল তার পিতা শম্ভুনাথ বাবু। জোহানারা বেগমের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে তার স্বামী নেতিবাচক আচরণ করলেও পরবর্তীতে পড়া লেখার ব্যাপারে সহায়ক ছিল ও তার পিতা-মাতা পুরোপুরি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

নারী-পুরুষের সমতা : সমাজের লোকজন নারী পুরুষকে সমান মর্যাদা দিলে নারীর প্রতি কোনো বৈষম্য থাকবেনা। ফলে নারীরাও পুরুষের মতো স্বাধীনভাবে সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে।

ধৈর্যশীলতা ও আত্মমর্যাদাবোধ : নারীদের সফল হতে হলে এ দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নারীদের কাজে বাধা-বিপত্তি আসবেই কিন্তু হাল ছাড়লে চলবেনা, ধৈর্য ধারণ করতে হবে। অন্যায় মেনে নেওয়া যাবে না, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে ও নিজের অধিকার আদায় করতে হবে।

সুতরাং, নারীর এগিয়ে চলার পথে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শিরোনাম :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত অপরিচিতা গল্পে তিনি কল্যাণী চরিত্রের মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী নারীর আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরেছেন ।

১

অপরিচিতা গল্প অনুসরণে কল্যাণীর সংকট এবং এ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তার দৃঢ়চেতা মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হলো :

যৌতুক প্রথার নির্মম বলি হয়ে কল্যাণী দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন । পিছনে ফেলে এসেছিলেন জাগতিক মায়া এবং সামাজিক নিয়ম - নীতির বেড়াজাল । কিন্তু এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে ছিলো নানাবিধ সংকট । কারণ বিয়ের আসরে বিয়ে ভেঙে যাওয়া কিংবা সারা জীবন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার মানসিকতা সমাজের বেশিরভাগেরই কাছে গ্রহণযোগ্য নয় । কিন্তু সে এসব চিন্তা বাদ দিয়ে স্বপ্ন বুনেছিলেন সুন্দর আগা

আর জয় করতে পারার চেষ্টা করেছেন তার দৃঢ় সংকল্প ও মনোবলের কারণে যা এখনকার নারীদের জন্য এক কঠিন শিক্ষা ।

2

অনুপম এবং অন্যদের ভূমিকা ইতিবাচক হলে কল্যাণীর জীবন কেমন হতে পারত, এর বিবরণ দেওয়া হলো :
কল্যাণীর জীবনটাও হতে পারত সমাজের অন্যান্য সংসারী নারীদের মত । কিন্তু এজন্য প্রয়োজন সবার সদিচ্ছা এবং ভালোবাসা যা কল্যাণীর ভাগ্যে জোটেনি । গল্পে অনুপমের মামার যদি অর্থের প্রতি লালসা না থাকতো কিংবা অনুপম যদি নিজেকে বোবা বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে প্রতিবাদী হতো তাহলে অবশ্যই কল্যাণীর জীবন হতে পারতো অনেক সুন্দর । সেও নিজেকে গড়ে তুলতে পারতো একজন আদর্শ বধু কিংবা মা হিসেবে । কিন্তু ভাগ্যের নিদারুণ বাস্তবতা মেনে নিতেই হবে আর চলতে হবে কণ্টকময় পথে ।

Scanned with CamScanner

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে চেনা / জানা কোনো নারীর এগিয়ে চলার পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হলো :

কল্যাণীর মত এক কণ্টকিময় পথ পাড়ি দিয়ে চলছেন আমাদের গ্রামের মোছা: রোকিনা বেগম । বিয়ের পর নতুন করে যৌতুকের টাকা দাবি এবং মারধরের কারণে তার সংসার ভেঙ্গে যায় এবং জীবন ও জীবিকার জন্য বর্তমানে সবজি ক্ষেত । কিন্তু এতে তাকে হতে হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন । যেমন:

ধর্মীয় কুসংস্কার : মেয়ে মানুষ হিসেবে বাহিরে কাজ করায় গ্রামে তাকে ধর্মীয়ভাবে তিরস্কার করা হয় । তাকে এড়িয়ে চলা হয় সর্বক্ষেত্রে ।

ইভটিজিংয়ের শিকার : মেয়ে মানুষ হওয়ায় তাকে প্রতিনিয়ত হতে হয় ইভটিজিংয়ের শিকার । রাস্তায় একা বের হওয়া হয়ে যায় দুরুহ ব্যাপার

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি : তাকে সামাজিক ভাবে আশ্বাস সহযোগিতা দিয়ে স্বাবলম্বী করার বদলে তাকে মনে করা হয় সমাজের বোঝা বা কলঙ্ক ।

অসহযোগিতা : তাকে তার সংগ্রামী জীবন চালাতে হয় একক চেষ্টায় । কারণ প্রায় সব জায়গায় হতে সাহায্যের বদলে পেতে হয় অসহযোগীতা ও বঞ্চনা ।

৪

পঠিত গল্প ও চেনা / জানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নারীর এগিয়ে চলার পথে সহায়ক দিকগুলো চিহ্নিত করা হলো :

গল্পের কল্যাণী বা আমার গ্রামের রোজিনা বেগমের চলার পথ বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক । যেমন :

সরকারি সহযোগিতা : পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের তাই দেশের প্রতিটি নাগরিকের মত এসব নারীদেরও আছে বিভিন্ন সুযোগ - সুবিধা পাবার অধিকার ।

যার ভিত্তিতে তারা সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপন

করতে পারবে ।

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন : আমাদের সকলকেই নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে এবং সবাইকে নিয়ে সমাজে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে হবে ।

নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ : সমাজে মেয়েদের ঘরে এবং বাহিরে সর্বত্র নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয় । তাই তাদের জন্য নিরাপদে চলাচল ও জীবনযাপনের ব্যবস্থা করতে হবে ।

আর এসবের মাধ্যমেই আমরা সমাজ তথা দেশকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তুলতে পারব ।

Scanned with CamScanner

শিরোনাম :

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) রচিত 'অপরিচিতা' গল্পে তিনি কল্যাণী চরিত্রের মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী নারীর সফল গাঁথা তুলে ধরেছেন। 'অপরিচিতা' গল্প এবং বাস্তব দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে নারীর এগিয়ে চলার পথে সহায়ক ভূমিকা নিম্নে চিহ্নিতকরণ করা হলো -

মূলকাজ :

১। 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সংকট ও দৃঢ়চেতা মনোভাব :

'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর সংকট হলো সঠিক সময়ে বিবাহ না হওয়া। মেয়ের বয়স পনেরো শুনে লেখকের মামার মন ভার হলো। কারণ তিনি মনে করলেন যে, ঐ মেয়ের বংশে কোনো দোষ আছে। তখন আট থেকে দশ বছর বয়সের মধ্যে কন্যার বিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। এ সময়ের মধ্যে মেয়ের বিয়ে না হলে মনে করা হতো মেয়ের বংশে কোন দোষ আছে। যে কারণে মেয়ের বিয়ে দেয়া হচ্ছে না। যে মেয়ের সাথে অনুপমের বিয়ের কথা চলছিল তার বয়স পনেরো। পনেরো বছর বয়সেও মেয়ের বিয়ে হয়নি, তা ভেবে অনুপমের মামার মন ভার হল।

কল্যাণী উচ্চশিক্ষিতা, রুচিশীল মেয়ে। শিক্ষকতাকে তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। তার শিক্ষাদীক্ষার কারণে বিবাহের সংকট দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করেছেন। কল্যাণীর দৃঢ়চেতনা মনোভাব তাকে এক নতুন কল্যাণী তৈরিতে সাহায্য করেছে। সংকট উত্তরণে কল্যাণীর দৃঢ় মনোভাব তাকে নতুন পরিবেশে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে।

২। গল্পের চরিত্রসমূহের ইতিবাচক ভূমিকায় কল্যাণীর জীবন:

'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণী ছিল বেশ সুন্দরী ও প্রাণচঞ্চল। তার পিতা শম্ভুনাথ বাবু ছিলেন ব্যক্তিত্বশালী ও একজন সুপুরুষ ব্যক্তি। অন্যদিকে কিন্তু অনুপমের মামা বিয়ের পণ-যৌতুক সম্পর্কে কোনো প্রকার ছাড় বা আপোস করতে রাজি নন। এখানেই গল্পের কাহিনী জটিলতায় রূপ নেয়। রীতিমতো বেশ আয়োজনের মধ্যে দিয়ে যদিও বিয়ের কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু এক পর্যায়ে দেনা পাওনা কারণে অত আনন্দ আয়োজন এক মুহূর্তেই ধূলিস্যাৎ হয়ে যায় অর্থাৎ যৌতুকের জন্য বিয়ে ভেঙে যায়। এই গল্পে অনুপমের চরিত্রের সীমাহীন দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুপম ও তার মামা ভূমিকা যদি ইতিবাচক হতো তাহলে কল্যাণীর সংসার সুখময় হতো বলে আমি মনে করি। কারণ বিবাহ ভেঙে যাওয়ার প্রধান কারণ হলো অনুপমের দুর্বলতা ও তার মামার যৌতুক প্রবণতা। শুধুমাত্র অনুপমের প্রতিবাদই পারত কল্যাণীর জীবনের দৃশ্যপট পাল্টে দিত। অনুপমের প্রতিবাদ এবং মামার ইতিবাচক মনোভাবই পারতো গল্পটিকে একটা সুন্দর পরিবারের প্রতিচ্ছবি হিসেবে দাঁড় করাতে।

৩। নারীদের এগিয়ে চলার প্রতিবন্ধকতা বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে:

পঠিত গল্প অনুসারে নারীকে এগিয়ে চলার পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো -

ক) অশিক্ষা
খ) ধর্মীয় গোঁড়ামি
গ) কুসংস্কার
ঘ) পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারী উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।

নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল:

Scanned with CamScanner

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

সাম্যবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই সত্য উচ্চারণ করলেও আজও আমাদের সমাজে তার যথাযথ স্বীকারোক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও আজও মানুষের ধ্যান ধারণার তেমন পরিবর্তন হয়নি। এখনও সমাজের প্রতিটা স্তরে স্তরে নারীদের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়।

অশিক্ষা, দারিদ্র্য আর কুসংস্কারে ডুবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীর প্রথম বাধাটা আসে পরিবার থেকে। অভিধানে 'উন্নয়নে নারী বা নারী উন্নয়ন' একটি অতি আধুনিক সংযোজন। এই ধারণা বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে স্বীকার করে। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতা দুটি বিষয়ই একটি অন্যটির পরিপূরক। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন বিষয়টি বিশেষ ভূমিকা রাখে।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতেই যখন নারীর পদযাত্রায় বারবার হোঁচট খেতে হয়, সেখানে তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশের নারী হিসেবে বাঙালি নারীদের প্রতিটি পদক্ষেপে অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারী উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। অথচ সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীরা আজ শুধু রান্নাঘরে সীমাবদ্ধ নয়, নারীরা পৌঁছে গেছেন বিমানের ককপিট থেকে পর্বতশৃঙ্গে। দশভুজা নারী ঘরে বাইরে নিজেকে আলোকিত করছেন নিজ প্রজ্ঞা আর মেধা দিয়ে। বর্তমানে এমন কোনো পেশা নেই যেখানে নারীর মর্যাদাপূর্ণ উপস্থিতি নেই। দেশে এখন প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দু'জন নারী। জাতীয় সংসদের স্পিকার একজন নারী। বর্তমানে সবক্ষেত্রেই রয়েছে নারীর পদচারণা।

নারীর সমঅধিকার ও নারীমুক্তির কথা যতই বলা হোক না কেন - উন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নশীল সব দেশেই নারীরা কম বেশি সহিংসতা ও বৈষম্যের শিকার। সামাজিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্র সবক্ষেত্রে এক। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশই নারী, কিন্তু নারীর অগ্রগতি ও উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে খুব অল্প সংখ্যক নারীর মধ্যেই। তাদের অনেকেই নিজের সিদ্ধান্তে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন না, নিজের বস্তুগত ক্ষমতার পরিসরে ও স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে বাধাগ্রস্ত হন।

নারীশিক্ষার বিষয়টি আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে অপরিহার্যভাবে জড়িত। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, "আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি শিক্ষিত জাতি দেব।" এ বিষয়ে আরবিতেও একটি প্রবাদ আছে, 'একজন পুরুষ মানুষকে শিক্ষা দেওয়া মানে একজন ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া, আর একজন নারীকে শিক্ষা দেওয়া মানে একটি গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা।' তাই নারীশিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনাতীত। তথাপি শিক্ষা ক্ষেত্রেও এ বৈষম্যের কোনো শেষ নেই। যদিও শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে এখন নারীদের অংশগ্রহণ শতভাগ।

মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠন। বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারাও তা স্বীকৃত। কিন্তু প্রায় ৫০ বছরেও আমরা তা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্রের অভাব ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পিছিয়ে দিচ্ছে নারীর উন্নয়নের যাত্রাকে। প্রচার মাধ্যমগুলোতে নারীর নেতিবাচক উপস্থাপন বন্ধ হতে হবে। নারী কোনো পণ্য নয়। নারীদের নিজেদেরও এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। নারী পুরুষের সমান স্বার্থরক্ষাকারী আইন প্রবর্তন ও আইনের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। নারী-নারীশিক্ষা ও নারীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। নারীর কাজকে কে তার কাজের যথাযথ শিক্ষা দিতে হবে। নারীর কাজে মূল্যায়ন হতে হবে। ছোট করে দেখা চলবে না। নারীর কাজে দৃষ্টিভঙ্গিতেই নারীর সার্বিক নারীর প্রতি ইতিবাচক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই নারীর সার্বভৌমত্ব,

Scanned with CamScanner

উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করাতে পারে।

অ্যাঙ্গেলস তার 'অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি' গ্রন্থে বলেছেন, "নারীমুক্তি তখনই সম্ভব যখন নারীরা সমাজের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে সমগুরুত্ব নিয়ে অংশগ্রহণ করবে।" তাই নারীর নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও নারী পুরুষ উভয়ের অন্তর্ভুক্তিকেই উন্নয়নের দেখা পাওয়া সম্ভব। এভাবেই নারীরা এগিয়ে যাবেন, তাদের ভবিষ্যৎ হবে কণ্টকমুক্ত।

৪। পঠিত গল্প অনুসারে নারীকে এগিয়ে চলার পথে সহায়ক ভূমিকাঃ

পঠিত গল্প অনুসারে নারীকে এগিয়ে চলার পথে সহায়ক ভূমিকা হলো:

(i) সর্বত্র নারীর শুধু অংশগ্রহণ বাড়ালে চলবে না, তার গুনগত উন্নয়ন জরুরি। কোনো দেশের উন্নয়নের জন্য নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায় গুরুত্বপূর্ণ। নারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে।

(ii) নারীর অনানুষ্ঠানিক কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা দরকার।

(iii) কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সংবেদনশীল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

(iv) মেয়ে ও ছেলেশিশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সবার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের পূর্ণ ব্যবস্থা করতে হবে।

(v) নারীবান্ধব আইনগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরি।

(vi) কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করতে হবে।

(vii) নারীর উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বে সাব ও ক্ষমতায়ন প্রয়োজন।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে গল্প থেকে আমরা বুঝতে পারি যে নারীর এগিয়ে চলার পথে সবচেয়ে বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে 'শিক্ষা'।

—সমাপ্ত

Scanned with CamScanner